কিষণলালের কপাল

আসলে কিষণলালের কপালটাই খারাপ। তা না হলে কারো গর্ভধারিনী জননী কখনও এমন শত্রুতা করে নিজের কর্তব্যপরায়ণ সন্তানের সঙ্গে? ছাদনাতলায় নববধূ রামপিয়ারির মুখখানা পলকের জন্যে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল তার।

অনতিদূরে কুমারী মেয়েদের ভিড়ে আটপৌরে ডুরে শাড়ি গাছ-কোমর করে পরা, বয়োজ্যেষ্ঠ বাল্যবন্ধু সুরপতির বালিকা কন্যা দুলারির নির্দোষ কলোচ্ছ্বাস কিষণলালের অন্তরে বেদনার মূর্ছনা তুলছিল থেকে থেকে। সুরপতি ঠাটাচ্ছলে কন্যার বাগ্‌দান করেছিল কিষণলালের কাছে। সাদামাটা নির্ভেজাল ভাল মানুষ সুরপতি। লেখাপড়া কাজকর্ম কোনকিছুই হ'ল না তার। যুবক বয়সে আধ ডজন খানেক সন্তানের জনক হয়ে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার ধর্ম পালন করে চলেছে এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনে।

কিষণলাল ওদিকে টপাটপ গ্রামের স্কুলের সবকটা পরীক্ষা পাশ করে শহরে পাড়ি দিয়ে নিজের অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিমত্তার জোরে সরকারী কাজে ঢুকেছে এবং নিজগুণে উপরওলাদের কাছে যশ কুড়িয়ে চলেছে অবিরত। সামরিক মেসে বেসামরিক বেয়ারার কাজ। শুনতে হয়তো এমন কিছু আহামরি নয় কিন্তু মাইনে-পত্তর, উপরি এবং বকশিশ টখশিশ মিলিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত চাকরী এই অভাব অনটনের বাজারে। তাই গ্রামের লোকেরা খুবই সম্মানের চোখে দেখে ওকে। সম্মান স্নেহ এবং শ্রদ্ধার চোখে। কারণ শহরের হাওয়া লেগেও কিছুমাত্র হেরফের হয়নি কিষণলালের। কোনও বদগুণ বদচলন বদবুদ্ধির ছিটে ফোঁটা দেখা যায়নি তার মধ্যে।

হয়তো সেকারণেই এতবড় অঘটনটা ঘটলো তার জীবনে। নইলে অমন লুফে নেবার মত পাত্রের গলায় লখনপুরের ধনি বেনে সিতাবচন্দের কালো কুচ্ছিত হাবা মেয়েটাকে জেনে শুনে ঝুলিয়ে দিতে সাহস করতো না কেউ। আজকালকার দিনে চোখ কান বুঁজে বিয়ে করে ফেলার মত ছেলে আর ক'জন আছে? তাও কিষণলালের মত অমন চৌকস চরিত্রবান সুপুরুষ ছেলে। মায়ের উপর অভিমান যে হয়নি তা নয় কিন্তু সে অভিমান মুখ বুঁজে বুকের মাঝে চেপেচুপে রেখেছে কিষণলাল। এ সবই যে মায়ের পেয়ারের ছোট ভাইয়ের কাণ্ড তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার।

বাবা মরতে মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে এসে উঠেছিল কিষণলাল। প্রায় আট-দশ বছর খাইয়েছে পরিয়েছে মামা, তাই এখন মোটা টাকায় সিতাবচন্দের কাছে ভাগ্নেকে বেচে দিয়ে ভাত কাপড়ের খরচটা সুদসুদ্ধ তুলে নিল। মোটা টাকা যে মেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিষণলালের, তা নইলে সিতাবচন্দ এমন খালি হাতে মেয়েকে স্বশুরবাড়ি পাঠায় কোন সাহসে? তাও যদি একটা মেয়ের মত মেয়ে হত। কিষণলালের মাও কিনা বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে ছেলের গলায় ওই হতকুচ্ছিত বুদ্ধিহীন মেয়েটাকে গেঁথে দিল অনায়াসে? নিজের ভাইয়ের লাভের দিকটাই দেখলো, ছেলের যৌবনের হাহাকার চোখেও পড়লো না তার !

শুধু সুরপতি আড়ালে ডেকে দু'হাত ধরে বলেছিল, "কিষণ, মনে বড় আশা ছিল ভাই আমার মেয়ে দুলারিকে তোর হাতে দেবো। সে আর হ'ল না। মেয়েটার আমার কপাল খারাপ। কি আর বলবো।"

কিষণলাল উদ্‌গত অশ্রু চেপে চেষ্টাকৃত সহজ গলায় বলেছিল, "দুলারির জন্যে ভেবো না। রাজরানী হবে তোমার মেয়ে। অমন দুগ্‌গা প্রতিমার মত" - গলা বুঁজে এল কিষণলালের।

নববধূ রামপিয়ারি আর দুলারির মুখ পাশাপাশি মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো। গলা ছেড়ে কাঁদতে সাধ গেল তার। সাধ গেল সেখানেই মাথা খুঁড়ে মরে সব জ্বালা জুড়োতে। কিন্তু স্থিতধী, ধৈর্যশীল কিষণলাল সংযম হারালো না।

ঠাণ্ডা গলায় বললো, "দুলারির বিয়ের ভার আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমায় কথা দিচ্ছি ওর যোগ্য পাত্র জোগাড় করে দেবো। শুধু সময় লাগবে কিছু, এই ধরো দু'চার বছর ----।"

বিয়ের দু'দিন পরেই বাক্স বিছানা এবং বউ সমেত শহরে পাড়ি দিল কিষণলাল। খুপরি ঘরে সংসার পাতলো। সারাদিন মেসের কাজকর্ম সামলে ঘরে ফিরে আবার সংসার সামাল দেওয়া। রামপিয়ারি কাজকর্ম কিছুই পারে না, শিখিয়ে পড়িয়ে যে নেবে সে আশাও নেই। একেবারেই জড়দ্‌গব একটি। কিষণলাল দাঁতে দাঁত চেপে নির্বাক দিন কাটায়। কোনও দোষারোপ করে না কাউকে। সাত আট মাস পরে রামপিয়ারিকে খালাস হবার জন্যে গাঁয়ে রেখে আসার সময় স্ত্রী সম্বন্ধে তার মনে কোন অসন্তোষের আভাস না দেখে ভারি নিশ্চিন্ত হন ওর মা এবং মামা। শুধু একটাই আবেদন ছেলের, তার বউকে যেন বাপের বাড়ি পাঠানো না হয় কোন মতেই। ক্ষুদকুঁড়ো যা জোটাতে পারে তাই দিয়ে বউকে রাখবে, বিয়ে দিয়ে আর মেয়ের যত্ন আত্তি করতে যেন না আসে সিতাবচন্দ।

সিতাবচন্দ মোটেই আপত্তি জানায় না এই ব্যবস্থায়। খুঁতো মেয়েটাকে গছাতে অনেক খরচ হয়ে গেছে, অনেক টাকা খাওয়াতে হয়েছে মেয়ের মামাশ্বশুরকে। ও মেয়ে যে স্বামীর সোহাগ পেয়েছে শেষতক, তাই আশাতীত সৌভাগ্য তার পক্ষে। জামাইয়ের অমতে মেয়ের খোঁজ খবর নিয়ে জামাইকে অসন্তুষ্ট করতে রাজী নয় সে। দোকান করে খায়, লোক লৌকিকতার খরচপত্তরের দিকটা সম্বন্ধে জ্ঞান টনটনে। তাছাড়া আরও পাঁচটা ছেলেপুলে এবং তাদের পিছনে দায় দায়িত্ব আছে। খামোকা বাড়তি খরচ মাথায় নিতে বয়ে গেছে তার।

এই ভাবে কটা বছর কেটে গেছে। বৎসরান্তে একবার করে গাঁয়ে আসে কিষণলাল। বউকে মামাবাড়ি মায়ের হেফাজতে রেখে কিছু খরচপত্তর মামার হাতে দিয়ে চলে যায়। মাসখানেক মাসদেড়েক পরে আবার নবপ্রসূতিকে নিয়ে শহরের সেই এক কুঠরির সংসারে ফিরে যায়। রোগা হারজিরজিরে রামপিয়ারিকে চেনাই যায় না আর। ফ্যাকাসে রক্তহীন মুখ, দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, কথা বলতেও যেন কষ্ট হয়। তার পাশে কিষণলালকে লাগে যেন খাপখোলা তলোয়ার। নির্মেদ শক্তিশালী প্রাণবন্ত উজ্‌জ্বল দেহ। দু'চোখের দৃষ্টিতে পালিশ করা ইস্পাতের সুকঠিন দ্যুতি।

সুরপতি বন্ধুর দু'হাত চেপে ধরে বলে, "ভাই, দুলারির চিন্তায় মুখে অন্ন রোচে না। এই আশ্বিনে সতেরোয় পা দেবে। আর যে ঘরে রাখা যায়

না !"

কিষণলাল আশ্বাস দিয়ে বলে, "আর বছর খানেক সবুর করো। ভগবান মুখ তুলে চাইলে সামনের বোশেখ মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে তোমার মেয়ের। পাত্র আমি দেখে রেখেছি। চিন্তা কোরো না।"

শহরের ডাক্তার বহুদিন আগেই সাবধান করে দিয়েছে, "রামপিয়ারির প্রাণসংশয়। অতি প্রজননে শরীর নিঃসার হয়ে গেছে তৈলহীন বর্তিকার মত। বউকে বিশ্রাম দাও ক'বছর, নচেৎ তোমার কপালে পত্নী বিয়োগ অবধারিত।"

কিষণলাল শুকনো মুখে ডাক্তারের রায় শোনে।

বাইরে এসে থুতু ফেলে বলে, "শালা ! ক'বছর ধরে এই বুকনি শুনে এলাম। ডাক্তার না হাতী। ঘোড়ার ঘাস বেচে ডাক্তারী পাশ করেছে সব।"

তার পরও আরও দু'টো বাচ্চা বিইয়েছে রামপিয়ারি। বুকের দুধ দিয়ে পেলেছে তাদের। যমজ দু'টিকে নিয়ে সাতটি সন্তানের মধ্যে পাঁচটি বেঁচে আছে। একখানা খুপরি ঘরে বাচ্চাগুলো যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ছিঁড়ে খেতে চায় মা'কে। কিষণলাল সকালে একগোছা রুটি বানিয়ে দিয়ে চলে যায়। ডিউটি সেরে ফিরে আসে সন্ধ্যে রাতে। তার দুপুরের খাওয়াটা মেসেই সেরে নেয় বরাদ্দ মত। আর দুর্বল-শরীর ক্ষীণবুদ্ধি রামপিয়ারি ওই পাঁচটি শিশুকে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে মরে।

এবার আর মামার হাতে বউ বাচ্চাদের খরচা বাবদ টাকা গুঁজে দেয় না কিষণলাল। মুখ আমসি করে বলে হাতে টাকা নেই মোটে। কিছু ধার দেনা হয়ে গেছিল, মাইনের বারো আনা সেই ভরতেই যাচ্ছে এ ক'মাস। যা করে পারো চালিও। আসছে বছর থেকে পুরো টাকা হাতে আসবে আবার। এ ক'টা মাস আমি একেবারেই অপারগ।

মামা মুখ অন্ধকার করে থাকে। কথা কয় না। ভাগ্নে দিয়েছে থুয়েছে প্রচুর। তাছাড়া পাকা সরকারী চাকুরে, ভবিষ্যতেও প্রাপ্তির আশা আছে আরও। তাই এক কথায় রাস্তা দেখাতে পারে না তাকে। চুপ করে থাকে। এই দেড় দু'মাস কাটাতেই হবে কোন মতে। হাড়কেপ্পন মামার বাড়িতে রামপিয়ারি আর বাচ্চাদের যে কেমন কাটবে আন্দাজ করতে অসুবিধে

হয় না কিষণলালের।

শহরে ফিরে যথারীতি ডিউটিতে লেগে যায় আর মনে মনে ক্যালেণ্ডরের পাতার দিনগুলো গুণে গুণে হিসেব রাখে। একমাস গেল। দেড়মাস যায় যায়। দুসংবাদটা টেলিগ্রামে আসবে আশা করেছিল কিষণলাল, কিন্তু শেষ অবধি একটা পোস্টকার্ডও আসে না তার নামে। কিষণলালের আজন্মের ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ আর বাধা মানে না। ভেঙে যাওয়ার দাখিল হয়। আহার নিদ্রা মাথায় ওঠে তার। শেষে আর থাকতে না পেরে দু'দিনের ছুটির দরখাস্ত ঠুকে ট্রেনে চড়ে বসে।

রাতভোর ট্রেনে কাটিয়ে ভোর রাতে ষ্টেশনে নেমে বাক্স বিছানা মাথায় তুলে গাঁয়ের পানে হাঁটতে শুরু করে টাঙ্গা গরুর-গাড়ির অপেক্ষা না করে।

দুপুর নাগাদ মামা বাড়ির দাওয়ায় এসে মালপত্তর নামিয়ে দম নিয়ে ডাকে, "মা, ওমা।"

সাড়া পেয়ে মা বেরিয়ে আসে। মামা বেরিয়ে আসে। বাচ্চারা কোলাহল জুড়ে দেয়। ছোট্ট দু'কুঠরির কুঁড়ে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে প্রস্তুত হয়ে কান্না ধরা গলায় শুধোয়, "ও কোথায়?"

মা ও মামা সপ্রশ্ন চোখে চায়, "কে?"

কিষণলাল ভাবে ওরা বুঝি ভাঙতে চায় না কথাটা।

ডাক ছেড়ে বলে, "রামপিয়ারি কই? আমার বউ?"

ওর মা হাত ধরে বসায় ওকে।

বলে, "মন খারাপ করিস না বাছা। সে যা দুদিন গেছে এখানে। গত শনিবার রাত্রে ব্যথা উঠেছিল। তুই তো টাকা-পত্তর দিয়ে যাসনি কিছু, তোর মামার অবস্থাও জানিস। তাছাড়া পুরোনো পোয়াতি। এবার আর কাউকে ডাকা হয়নি তাই। তাছাড়া দেশে গাঁয়ে আছেই বা কে যে ডাকবো? ফুলমনি ধাইয়ের বড় বদনাম। তা রাতের বেলা ব্যথা উঠলো। মাঝরাতে দেখি সব চুপচাপ। বউয়ের আর সাড়া নেই। ডাকলে চোখ খোলে না। তখন পাশের বাড়ি থেকে সুরপতিকে ডেকে আনলাম। ওর মা বউ সবাই এলো। গাঁয়ের আর পাঁচজন মেয়ে পুরুষও এলো।

"সেই অন্ধকার রাতে সুরপতি গাড়িতে বলদ জুতে বউমাকে তিন কোশ দূরে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার বললো বাচ্চাটা পেটের মধ্যেই মরে রয়েছে। মায়েরও বাঁচার আশা কম। সুরপতিই ধারধোর করে কোথা থেকে টাকা জোগাড় করলো। কড়া কড়া ওষুধ ইনজেকশন পড়লো ক'দিন ধরে। এই পরশু দিন থেকে বউমার অবস্থা ফিরেছে। ডাক্তার বলেছে বিপদ কেটে গেছে, আর হপ্তাখানেক পরেই ছাড়া পাবে হাসপাতাল থেকে। তবে --"

কিষণলাল আর্তকন্ঠে প্রশ্ন করলো, "তবে?"

"মরা বাচ্চাটা বার করার সময় জরায়ু নষ্ট হয়ে গেছে। এর পর আর নাকি বাচ্চা হবে না বৌমার।"

কিষণলাল তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি ধপাস করে বসে পড়লো আবার। ওর চোখের সামনে ঘরখানা বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। মা, মামা, ছেলেমেয়ে পাঁচজন - সবাই যেন তাণ্ডব নৃত্য করছে ওকে ঘিরে ধরে। দু'হাতে মুখ ঢাকলো কিষণলাল।

সুরপতি এসে ঘরে ঢুকলো। ছেলেমেয়ের কাছে কিষণলালের আগমন বার্তা পেয়ে।

তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে ডাকলো, "কিষণলাল, ভেঙে পড়িস না ভাই। বাচ্চাটাকে বাঁচানো গেল না, কিন্তু ভাবিজীকে বাঁচাতে পেরেছি। ডাক্তার বলেছে তার প্রাণের ভয় আর নেই। আসছে হপ্তায় বাড়ি আসবে। অনেক ধার দেনা করতে হয়েছে ভাই, কিন্তু সে জন্যে আক্ষেপ নেই। এই তুই এসে গেছিস, সে সবের একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।"

কিষণলাল রক্তবর্ণ চোখে নিঃশব্দে চেয়ে রইলো। মুখে বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না তার।

সুরপতি নরম গলায় বললো, "সে যা দিন গেছে আমাদের কি বলবো। কেউ কল্পনাও করেনি যে ভাবিজী আবার চোখ খুলে চাইবে। একেবারে মরার মত সিঁটিয়ে ছিল। কত কত ইঞ্জেক্শন্ দিয়ে, রক্ত দিয়ে তবে চাঙ্গা হল। দুলারির মা বলছিল অত ধারদেনা করছো শুধবে কে? বললাম কিষণলালের বউ না বাঁচলে আমি ওকে মুখ দেখাবো কি করে? এই দেশে গাঁয়ে বউকে রেখে যায় আমাদের ভরসাতেই তো ! তাছাড়া

আমার দুলারির ব্যবস্থা করে দেবে, আমায় কন্যাদায় থেকে মুক্ত করবে আর তার বিপদে আমরা না গিয়ে দাঁড়ালে সে যে দারুণ বেইমানি হবে।"

কিষণলাল দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "কম্‌বখ্‌ত্‌।"

সুরপতি হকচকিয়ে গিয়ে বললো, "এ্যাঁ?"

"বেয়াক্কেলে বিটলে বুরবক কহিঁকা ---- "

কিষণলালের মা ও মামা কক্ষান্তরে গেছিল। ওর তর্জন শুনে দরজায় এসে সন্ত্রস্ত কন্ঠে বললো, "কি বাবা, কি হ'ল?"

সুরপতি ইশারায় নিরস্ত করলো তাদের।

ব্যস্ত কন্ঠে বললো, "ট্রেনে ঘুমটুম হয়নি। চান করে খেয়ে টেনে ঘুম দিক এখন। বিকেলে গোরুর গাড়ি করে হাসপাতালে ঘুরে আসবে। মাসিমা, ওকে ভাত খাইয়ে দিন তাড়াতাড়ি।"

কিষণলালের মা গামছা ও তেলের বাটি হাতে এগিয়ে এলেন।

"ঠিক বলেছ বাবা। যা বাছা ঘাটে গিয়ে চান করে আয়, চটপট ভাতেভাত চড়িয়ে দিচ্ছি। বাছার আমার কম ধকল গিয়েছে নাকি! দুগ্গা দুগ্গা।"

কিষণলালের এক হাতে গামছা ও অন্য হাতে তেলের বাটি ধরিয়ে দিয়ে মা রান্নার জোগাড়ে গেল। কিষণলাল সপ্নাবিষ্টের মত অদেখা চোখে সমুখ পানে এগিয়ে চললো।

সুরপতি নিম্নকন্ঠে মামাকে বললো, "মনে আচমকা ধাক্কা লেগেছে। বাচ্চাটা বাঁচলো না শেষ অবধি। হাজার হোক বাপের প্রাণ তো!"

মামা ঠোঁট উলটে বললো, "জানিনে বাপু এসব শহুরে ঠাট বাট। যত্ত সব বাড়াবাড়ি।"

কিষণলাল সেই যে ঘাটে গেল, আর ফিরলো না। সেখানে একটা আম গাছ তলায় তেলের বাটি নামিয়ে রেখে ধুতি ছেড়ে গামছা পরলো। তারপর সেই ধুতি গলায় বেঁধে গাছের ডালে লটকে পড়লো সে। কেন যে সে একাজ করলো তা তার আত্মীয় পরিজন বন্ধুদের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে আজও।